ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

সীমিত বাজেটে অধিক স্বাস্থ্যসেবা

অনেক সময় সীমিত সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারক ও সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, ব্যয়ের খাতগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করা, সময়মতো বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার, দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করা। খাতওয়ারি সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে জাতি হিসেবে আমাদের এত সমস্যা থাকত না। কথাগুলো আমরা যত বেশি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে পারব, তত সহজেই আমরা দেশবাসীর জন্য স্বল্প বরাদ্দ নিয়েও অধিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারব

'অগ্রগতির ধারাবাহিকতা, সম্ভাবনাময় আগামীর পথে বাংলাদেশ'-শিরোনাম দিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য দুই লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার এক বিশাল বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করেছেন। বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণ, নতুন সরকারের জনপ্রিয়তা অর্জন এবং দেশকে মধ্য-আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের আকাঙ্ক্ষার চাপ পূরণ করতে বিশাল আকারের এই উচ্চাভিলাষী বাজেট পেশ করা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বেশ কয়েক বছরের মতো এ বছরও স্বাস্থ্য খাত বাজেট বরাদ্দে গুরুত্ব হারিয়েছে। শুধু স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ নয়, স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দৈনিক কালের কণ্ঠ মন্তব্য করেছে, 'স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বাড়ানোর দাবি যতই জোরালো হচ্ছে, ততই যেন জাতীয় বাজেটে এই খাতের গুরুত্ব কমছে। গত বছর সংশোধিত বাজেটে ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল স্বাস্থ্য খাতে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে উল্টো কমানো হয়েছে এবং বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ। তবে টাকার অঙ্কে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় এ বছর ৮৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ বেড়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। পরবর্তী সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ ৫ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে শতাংশের হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল যথাক্রমে ৬ দশমিক ১৮ এবং ৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হ্রাসের হার ধারাবাহিকভাবে কমার কারণে বিশেষজ্ঞ মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার আগের দিন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম নতুন বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই বরাদ্দে আমি মোটেই সন্তুষ্ট। স্বাস্থ্যের মতো জরুরি খাতে যদি বরাদ্দ বাড়ানো না হয়, তাহলে কাজ চলবে কী করে?' স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অসন্তোষকে আমরা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিই।

স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের পেছনে সরকারের কিছু প্রশংসনীয় সাফল্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার মনে হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়া এই সরকার জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২ এবং ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১২ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে প্রশংসার দাবিদার। যদিও এসব খাতে সরকার যতটুকু সাফল্য অর্জনের দাবি করে থাকে, ততটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন না। যেমনটা আগে বলেছি—বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১১ অনুযায়ী পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে বর্তমানে ৫৩-তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ছিল প্রতি হাজারে ২৩৩ জন। এ ছাড়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্যমাত্রা প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৬ সালে প্রতি লাখে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুহারের সংখ্যা ছিল ৬৪৮ জন। ২০০১ সালে এ সংখ্যা নেমে আসে ৩২২-এ। ২০১১ সালের সার্ভে মোতাবেক এই সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৪-তে। এসব মৃত্যুহার কমার পেছনে যেসব উপাদান কাজ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে—বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাদান, বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, দেরিতে সন্তান নেওয়া এবং দেশজুড়ে প্রতিষেধকের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ। পোলিও ও কুষ্ঠরোগ মোটামুটি নির্মূলের পথে। শিশুদের ভিটামিন-এ খাওয়ানোর হার বেশ বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতে আরো একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি। ১৯৭০ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৪ বছর। ২০১১ সালের সার্ভে অনুযায়ী তা দাঁড়িয়েছে ৬৮ বছরে। এসব সাফল্যসহ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মতো অন্য কিছু ছোট-বড় সাফল্যের কারণে হয়তো সরকারের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে এবং সরকারকে সংযমী ও মিতব্যয়ী করে তুলেছে। তবে সরকারি নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে, কিছু সাফল্য ও অর্জনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ শেষ হয়ে যায় না। অর্জিত সাফল্য আর অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচুর অর্থকড়ি ছাড়াও সরকারকে অনেক উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষিতে সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো—অপুষ্টি দূরীকরণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অপুষ্টির হার এখনো বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। এখনো দেশের অর্ধেক শিশু ও এক-চতুর্থাংশ মা অপুষ্টিতে ভুগছেন। বর্তমানে প্রতিবছর বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫০ হাজার শিশু অপুষ্টির কারণে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু ছাড়াও অপুষ্টি দূর করা না গেলে বাড়ন্ত শিশুদের যেকোনো সময় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অপুষ্টির মূল কারণ দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব। ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার। বলে রাখা প্রয়োজন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জন আশানুরূপ নয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়স্ক ৪৫ শতাংশ শিশু এখনো মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে।

গত কয়েক বছর স্বাস্থ্য খাতে হরেক রকম কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়লেও মৌলিক কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সাংবিধানিকভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সরকার দেশের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারছে না। এটা শুধু বাজেটে অর্থ বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে নয়। এটা ঘটছে সরকারের সদিচ্ছা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সততার অভাবের কারণে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে দুই ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিৎসাসেবার বিধান চালু রয়েছে। পাবলিক সেক্টরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল-জেলা, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং গ্রাম পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসে মূলত গ্রামগঞ্জ ও শহরের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষ। দেশের বিদ্যমান সরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর অবস্থা বেশ দুর্বল, নাজুক ও ভঙ্গুর। এসব হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা উপকরণ, ওষুধপত্র, পর্যাপ্তসংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে যুগ যুগ ধরে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বেশ কিছুদিন ধরে দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো শহরকেন্দ্রিক হাসপাতাল, ক্লিনিক, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর বেহাল দশার বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। গত ২৩ মে দৈনিক কালের কণ্ঠে 'বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ সরকারি হাসপাতালগুলোর অবস্থা এমন অত্যন্ত শোচনীয়। ভবন আছে, বরাদ্দ আছে, কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামও আছে; কিন্তু চিকিৎসা নেই। সম্পাদকীয়তে যে কথাটি খুব গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, তা হলো—স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসকের পদ থাকলেও নিয়োগ নেই, নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের অধিকাংশই কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত নেই। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিপুল অর্থ ব্যয় করে স্বাস্থ্যসেবার যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, কার্যকর মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণের অভাবে তা এক অর্থহীন উদ্যোগে পরিণত হতে চলেছে। এসব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে মানসম্মত চিকিৎসাসেবার উপযোগী সুযোগ-সুবিধার অনেক ঘাটতি রয়েছে। ওষুধ নেই, বেশির ভাগ হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স নেই, এক্স-রে মেশিন কিংবা অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই। যন্ত্রপাতি থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো অধিকাংশ সময় অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার এসব অসংগতি দূর করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে আরো কঠোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩ জুন তৌফিক মারুফ দৈনিক কালের কণ্ঠে 'দিনে ১৮ ঘণ্টাই ডাক্তারশূন্য' শীর্ষক একটি বৃহদাকারের প্রতিবেদন লিখেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিস্ময়কর হলেও সত্যি, দেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলো দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৮ ঘণ্টাই থাকে চিকিৎসকশূন্য। বছরের পর বছর এভাবেই চলে আসছে ওই হাসপাতালগুলোর ইনডোর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম। বিভিন্ন হাসপাতালে সরেজমিনে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, কার্যত বেলা ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে হাসপাতাল ছাড়েন ডাক্তাররা, আবার পরের দিন সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টায় ফেরেন হাসপাতালে। বাকি সময় হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোর রোগীরা ইন্টার্ন ও অনারারি চিকিৎসকদের হেফাজতেই থাকে। অনেকেই জানেন না যে শিক্ষানবিশরা রোগীর জন্য প্রেসক্রিপশন দিতে পারেন না। অথচ দিনের ১৮ ঘণ্টাই তাদের মুখের দিকে চেয়ে অসহায় রোগীরা পড়ে থাকে হাসপাতালে।' বিদ্যমান হাসপাতালগুলোর এই যদি অবস্থা হয়, তবে অর্থমন্ত্রীর কথামতো ১০টি জেলায় নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যমান হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, হাজার হাজার জনবল নিয়োগ দিয়ে আমরা কী স্বাস্থ্যসেবা আশা করতে পারি? অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা-একাগ্রতা, সততা, দায়িত্ব-কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত না করা গেলে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে এ দেশের সাধারণ দরিদ্র অসহায় মানুষ। সেটা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। কর্মক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও বিধিবিধানসংবলিত একটি নীতিমালা থাকা জরুরি। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও দেশে একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা গেল না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বারবার বলে আসছে, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু কবে নাগাদ যে এই চূড়ান্ত স্বাস্থ্যনীতি সত্যিকার আলোর মুখ দেখবে, এর উত্তর অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। গত ২০ অক্টোবর ২০১২ জাতিসংঘের জনসংখ্যাবিষয়ক সংস্থা ইউএনএফপিও কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখে গিয়ে পৌঁছেছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায়। গত চার বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। দেশের ৪৫ শতাংশের বেশি দম্পতি এমনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের বাইরে রয়ে গেছে।

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব মহামারি আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগের পাশাপাশি হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, আর্থ্রাইটিস, অ্যাজমা ও হতাহতের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে করে এসব রোগ-বিমারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারে সরকারকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় ছাড়াও এক মহাচ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এসব রোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব মানুষ। সরকারি হাসপাতালে এসব রোগের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে রোগীকে ছুটতে হয় অত্যাধুনিক বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে। এসব বেসরকারি হাসপাতালে লাখ লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা নেওয়ার সামর্থ্য খুব কমসংখ্যক লোকেরই রয়েছে।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো ওষুধ। বর্তমান প্রেক্ষিতে দেশে একটি যুগোপযোগী ওষুধনীতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ১৯৮২ সালের যুগান্তকারী ওষুধনীতির কারণে দেশে সুলভমূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। নকল, ভেজাল, ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধে বাজার এখন সয়লাব হয়ে গেছে। কয়েক বছর ধরে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ক্রমেই যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে করে বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে মানুষকে ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

অনেক সময় সীমিত সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারক ও সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, ব্যয়ের খাতগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করা, সময়মতো বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার, দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করা। খাতওয়ারি সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে জাতি হিসেবে আমাদের এত সমস্যা থাকত না। কথাগুলো আমরা যত বেশি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে পারব, তত সহজেই আমরা দেশবাসীর জন্য স্বল্প বরাদ্দ নিয়েও অধিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারব।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@gmail.com